OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 29 - 37
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মধুকবির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে দ্বৈত নারীর ভূমিকা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের আলোকস্নাতা মানবীবন্দনা

ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : sampriyaas@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Conflict, depression, shyness, social restrictions, mythological atmosphere, construction, individuality of women.

Abstract
Michel Madhusudan Dutt was a bright star of Bengali Literary World. Poet, dramatist, essayist Madhusudan gave a new form to the discourse of Bengali Language and Literature. In order to re-evaluate this talented writer in the light of his conflicted personal life and his famous literary work Birangana. One of the most important events in his life is marriage with Rebecca, who was the foreign christian girl. Letter coming to Calcutta and living together with Henrieta greatly influenced his conflict diverse life. Rebecca along with her little four children was injustice abandoned by the poet and Michel left them in Madras. Meanwhile he had to leave a life of poverty and humiliation because he was not legally married to Henrietta. The return notices that true heartache of the poet. Reflections on the mindset of Rebecca and her children are found in Madhusudan's later writings particularly in this regard are the Birangana Patrakabya. Michel's remarkable eloquence can be found in some epistle of Birangana. He has managed to forget his helpless wife and four children. Michel's legacy of not being able to take news of his wife and children in his personal life was the ultimate negligence of duty and responsibilities. Birangana is a reflection of that. Married life with two women as well as the Renaissance of enlightened selected women in Birangana is the topic of discussion in this article.

Discussion

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্য জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। তাঁর লেখনীর স্বতন্ত্র গুণ তাঁকে বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ভুবনে পাঠক সন্ধান পেয়ে যান চিরচঞ্চল, ব্যতিক্রমী, দুর্জয়, ভাগ্যবিড়ম্বিত, উৎকেন্দ্রিক মধুসূদনের। বাঙালি হিন্দু পরিবারের একমাত্র আদরের পুত্র মধুসূদন দত্ত জীবনের প্রথমার্ধ থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। কলকাতায় খিদিরপুরের বাড়িতে এসে হিন্দু কলেজে পড়ার সময় খ্রিস্টধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কায়মনোবাক্যে ইংরেজ হবার বাসনা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজ থেকে চ্যুত হলেন মধুসূদন। অন্যদিকে হারালেন পারিবারিক মর্যাদা। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত প্রথিতযশা উকিল হওয়ায় তাঁদের পরিবারে সামাজিক সম্মানের দিক থেকে দারুণ শোকাবহতার সৃষ্টি হল। মধুর মা জাহ্নবী দেবী ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন একমাত্র ছেলে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হওয়ায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক মধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এতে অবাক হয়েছিলেন। মধুসূদনের ব্যাপটিজমের ঘটনা নিয়ে সে সময় কলকাতা আলোড়িত হয়েছিল। আজন্মলালিত হিন্দু সংস্কৃতির ঘেরাটোপ ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ঘটনায় অভূতপূর্ব সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন মধু। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সেই আকর্ষণই তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহী করেছিল এমন কথাও বহুল প্রচলিত। সময়ের ক্রান্তিলগ্নকে উপলব্ধি করেছিলেন মধুসূদন। বাঙালি থেকে খাঁটি ইংরেজ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। গোলাম মুরশিদ তাঁর আশার ছলনে ভুলি গ্রন্থে মর্মবিধুর বর্ণমালায় গ্রন্থন করেছেন মধু কবির জীবনকথা। সাহিত্যের দিকপাল লেখক বাল্মিকী, হোমার, বেদব্যাস, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো এবং মিলটন প্রমুখের লেখা থেকে সজীবতার প্রাণরস সংগ্রহ করার মতো উজ্জীবনী শক্তি ছিল মধুসূদনের। পৌরাণিক, মহাকাব্যিক ভাবধারা তাঁর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যমহল থেকে এই ধারণা প্রচলিত ছিল অনেকের মনেই। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভালোবেসে প্রীতিবান মধুসূদন তার ভবিষ্যতের কাব্যলক্ষ্মী রূপে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষাকে। বঙ্গভাষা সেখানে ছিলেন অবহেলিতা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অসংযমী, বেহিসেবি মানসিকতাসম্পন্ন মধুসূদন কখনোই তাঁর বড়ো হওয়ার কালে বাংলা ও বাঙালিকে নিজের বলে ভেবে উঠতে পারেননি। অত্যুৎসাহিতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সচ্ছল পরিবারের সান্নিধ্য মধুসূদনের জীবনের পথকে প্রথম থেকেই পরিচালিত করেছিল অন্যভাবে। ফলে পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁর উৎকেন্দ্রিক জীবন শুরু হয়েছিল। ধনী জমিদার পরিবারে মধুসূদনের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যথার্থ সহধর্মিণী পাবেন না জেনে মধু এই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও একই সময়ে তঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করেছিলেন। মধুসূদনের সমসাময়িক কালে তাঁর মতো আধুনিকমস্ক মানুষ খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতক নবজাগরণের কাল। স্বাজাত্যবোধ তথা দেশাত্মবোধের উজ্জীবনের কালপর্বে প্রগতিশীল মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ উপনিবেশবাদের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। চূড়ান্ত বস্তুবাদী মধুসূদন সেই কালপর্বে চাননি তাঁর সময়ের মতো হতে।

শতসহস্র সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করে তিনি সময়কে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানে। যে মেয়েটিকে তার বাড়ির পক্ষ থেকে তাঁর জন্য নির্বাচিত করে দেওয়া হল; তার সঙ্গে কোনোভাবেই একাত্মতা অনুভব করতে পারবেন না তিনি। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর পিতার একাধিক বিবাহ মধুসূদনের আত্মপীড়াকে অতিশয় বাড়িয়ে তুলেছিল। তবু নবজাগরণের প্রভাব, বিদেশে গিয়ে শিক্ষা অর্জন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ, নীলনয়না সুন্দরীকে হৃদয় সমর্পণ করা - এসবের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি তিনি। তাঁর নিয়তি তাঁকে প্রথম জীবন থেকেই ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের ঘেরাটোপ এর মধ্যে নবায়মান জীবনের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই জীবনের ভাবধারা ক্রমশ পাল্টাতে থাকে তাঁর। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ইতালিয়ান, ফরাসি, হিব্রু, তামিল, তেলেগু ভাষা জানতেন তিনি। এতগুলি ভাষা জানার ফলে বেশিরভাগ ভাষায় রচিত সাহিত্য মূল ভাষাতেই পড়তে পেরেছিলেন তিনি। মধুর প্রকৃত জীবনসঙ্গিনীর অনুসন্ধান শুরু এখানেই। বাঙালি পরিবারে যেমন বয়সের পার্থক্য এবং বিবাহরীতি তিনি দেখেছেন - তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। খ্রিস্টান হওয়ার পর পিতার কাছে আর্থিক সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বলেই তিনি মাদ্রাজে গিয়ে অরফ্যান অ্যাসাইলামে পড়িয়েছেন। তার পরিচয় ঘটেছে রেবেকার সঙ্গে। মাদ্রাজে গিয়ে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেই মাইকেল তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকার প্রেমে পড়েন। রেবেকার পারিবারিক জীবন বিয়ের পূর্বেও খুব সুখের ছিল না। রেবেকা প্রকৃত অর্থে বড়ো হয়েছিলেন অরফ্যান অ্যাসাইলামে। ফলে তরুণ কবির ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা স্বাভাবিক অর্থে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সামান্য গোলন্দাজ সৈনিকের মেয়ে রেবেকা চিরকালীন দারিদ্র্যের পীড়ায় পিষ্ট হয়েছিলেন। মাইকেল তাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন - এ প্রত্যাশায় তিনি বন্ধু ও অন্যান্য অভিভাবকপ্রতিম মানুষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মধুসূদনকে বিয়ে করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

"প্রথম যৌবন থেকে তিনি ভালোবাসার ধ্যান করেছেন - নীলনয়নাকে ভালোবাসার।"[১]

মাইকেল ও রেবেকার চারটি সন্তানের সন্ধান পাওয়া যায়। তরুণ কবি তাঁর অভাবের পীড়ন, নানাবিধ কাজ করে সংসার চালানোর প্রচেষ্টা করেই সন্তানদের দায়িত্বশীল পিতা হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। প্রেমের পরিপূর্ণ অনুরাগ তাঁর এ সময়ের লেখালেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সন্তান ব্যার্থা জন্ম নিয়েছিল চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। পরের সন্তানরাও এরকম অনটনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। পুত্র মাইকেল জেমসের ব্যাপটিজমের ব্যবস্থা মাইকেল করতে পারেননি। মাদ্রাজ স্কুলে চাকরি নেবার পর জর্জ জাইলস হোয়াইটের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে মাইকেলের। আর জর্জ স্ত্রীর মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে কন্যা হেনরিয়েটার সমবয়সী এমিলি জেইন শর্টকে বিয়ে করেন। বাংলাদেশের দাম্পত্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের নমুনা দেখে বীতশ্রদ্ধ মাইকেল একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখে স্বাভাবিক অর্থে হেনরিয়েটার সমব্যথী হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্রাজ স্কুলে চাকরি পাবার পর থেকেই কবি ও রেবেকার আপাত সুখের দাম্পত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। মাইকেল রেবেকা আর হেনরিয়েটার মধ্যে নির্বাচনের দিকটি স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কবির কলকাতা যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দ্বৈত সম্পর্কের চিত্র রেবেকার কাছে স্পষ্টতা পায়। নিজের স্বাভিমানকে বজায় রেখে একদিন শুধু ভালোবাসার সম্পদ নিয়ে যাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন তাঁকে কোনোভাবেই ক্ষমা করতে পারেননি রেবেকা। পুত্র মাইকেল জেমসের মৃত্যুর পরও কবি পরিবারের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখেননি। অনন্ত দারিদ্র্য, কটূক্তি, সমস্যার প্রবাহে দায়িত্ব - কর্তব্য জ্ঞানহীন নির্মম ব্যক্তির মতোই রেবেকাসহ সন্তানদের মাদ্রাজে রেখে চুপিসাড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন কবি। তার এই নির্মমতা স্বাভাবিক অর্থে বিস্ময়কর। তবু মানুষের পক্ষে হয়তো সবই সম্ভব। প্রকৃত অর্থে রেবেকা ও হেনরিয়েটার মধ্যে নির্বাচনের জায়গাই তাঁর কাছে বোধ হয় এক এবং একমাত্র পথ ছিল। রেবেকার কাছে প্রেমিক স্বামীর অধিকার নিয়ে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। জীবনের উপেক্ষিতা রূপে কবি রেবেকাকে ত্যাগ করেছিলেন। কোনো না কোনোভাবে নিজের পিতার মতোই এক জীবনসঙ্গিনী ও সন্তানদের বর্তমানে তিনি অন্য নারীর সান্নিধ্য স্বেচ্ছায় লাভ করেন। এই উদ্দামতাই তাঁর চরিত্রকে নিয়ত তাড়িয়ে ফিরেছে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো। হেনরিয়েটার জন্য রেবেকার সুখের দাম্পত্যনীড় ভেঙ্গে যায়। ব্যর্থতার করুণ কাহিনি দেখা যায় পরবর্তী সময়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

> "যে - সন্তানদের রেবেকা পক্ষীমাতার মতো দুই পাখার নিরাপত্তা দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অতো ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও তাঁদের জীবনের গতি স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি।"[২]

জীবনের নিগুঢ় সমাপতনে রেবেকার পর শুরু হয় হেনরিয়েটার সঙ্গে জীবনযাপন। রেবেকার সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ না হওয়ায় হেনরিয়েটাকে বিয়ে করতে পারেননি মাইকেল। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিদেশযাত্রার সময় তিনি হেনরিয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁদের প্রথম সন্তান শর্মিষ্ঠা। তারপর মধুকবির জীবনের এক নতুন সাহিত্যপর্ব শুরু হয়। সন্তানদের স্মৃতি, রেবেকার স্মৃতি তিনি ভাগ করতে পারেননি কারোর সঙ্গে। কিন্তু মনে মনে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন তাদের জন্য। সঙ্গত কারণবশত হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর যে তিন সন্তান জন্ম নিয়েছিল তাদের সান্নিধ্য মাদ্রাজে ফেলে আসা অপর চার সন্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মাইকেলকে। আবেগপ্রবণ, অনুভূতিশীল কবি কেমন করে তঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ও চার সন্তানের সঙ্গে বঞ্চনার এক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেন - সেই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যেও। হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টন ডাট। কবির ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতি এবং তার সঙ্গে মহাকাব্যিক পৌরাণিক বাঙালি আবহ দুইই তাঁর হৃদয়সংলগ্ন ছিল। বিদেশযাত্রার পর হেনরিয়েটা একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করেন। বস্তুবাদী ভোগের প্রতি আকৃষ্ট মধুসূদন চূড়ান্তভাবে চেয়েছিলেন সচ্ছল এবং সুখী জীবনযাপন করতে। কিন্তু নিয়তির তাড়নায় তিনি শুধু এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। রেবেকা বা হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে সুখী হতে পারেননি। শর্মিষ্ঠা ছাড়া তাঁর আরো দুই জীবিত পুত্রসন্তান হেনরিয়েটার সঙ্গে বর্তমান ছিল। মধুর ছোটোছেলে ম্যালেরিয়ায় মারা যান। অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন বেঁচে থাকেন তাঁর আর হেনরিয়েটার তরফের সন্তানদের মধ্যে দীর্ঘজীবী হয়ে। পিতার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন সন্তানদের জীবনকেও অতিশয় দুর্ভাগ্যের গহিন অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল সন্দেহাতীত ভাবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতিশয় প্রতিভাধর, পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, আবেগী কবির মর্মান্তিক জীবন পরিণতি প্রয়াণের পরেও তাঁকে ত্যাগ করেনি। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করতে যথেষ্ট সামাজিক বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় তাঁর পরিচিত খ্রিস্টান পরিজনদের। এদিক থেকে উনিশ শতকের মতো নবজাগরণের ক্রান্তিলগ্নে মানুষের মানসিকতার নিবিড় তথা নিচু মানসিকতা সাম্প্রতিককালের পাঠককে ভাবায়। প্রকৃত অর্থে মানুষ তার কর্মবৃত্তের পরিধির বাইরে গিয়েই জনসমাজে পরিচিত হয়; সেই উদাহরণ নিবিড় দক্ষতায় উনিশ শতকের সমাজ কবিকে দিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদান করার উপলক্ষে যশোর হয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী যাবার সময় মাইকেলের যশোরস্থিত প্রাচীন বাড়ি, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। জীবন বড়োই বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তার শুরু দেখে কখনোই তার অন্তিম পরিণতির মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সেই বার্তাটি কবির অতীত ঐশ্বর্য দেখে মূল্যায়ন করা যায়। তবে সাহিত্যকীর্তির মধ্যে কবি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ স্মৃতিমগ্ন কথালাপ তুলে রেখে গেছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য কবি রচনা করেছেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই কাব্য প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেছেন সমকালীন সময়ের অন্যতম বরেণ্য করুণাময় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বাঙালি নারী সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে যে মহামানব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন - সেই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে নিবেদিত বীরাঙ্গনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণতা বহন করে। রোমক কবি ওভিদের 'Heroides' পত্রকাব্য অবলম্বনে মধুসূদন রচনা করেন 'বীরাঙ্গনা'। বৈচিত্র্যগত স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও কাব্যের প্রতিটি পত্রই ভাবগত ঐকতানে বাঁধা। উনিশ শতক যেমন নবজাগরণের ক্রান্তিলগ্ন; তেমনই নারীচেতনার বিকাশের কাল। নবজাগরণের বঙ্গীয় শতদল তাই মাইকেল সচেতনতার সঙ্গেই উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরের প্রতি। 'বীরাঙ্গনা'-র পত্রগুলির মধ্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' এবং 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' - পত্রগুলিতে কবি রেবেকার আত্মবয়ানকে বিনির্মাণ করেছেন যেন। 'যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা' এবং 'নলের প্রতি দময়ন্তী' - পত্রদু'টিতে নারীমনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ব্যাকুলতা, আকুতি প্রিয়তমকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। আত্মসম্মানে অবগুণ্ঠিতা তিনি নারী অভিভাবকপ্রতিম মানুষগুলির কাছে খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি মাইকেল চলে যাবার পর। প্রেমিক স্বামী মাইকেলকে তিনি জীবন - যৌবন সমর্পণ করে ভালোবেসেছিলেন। চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। খ্রিস্টিয় সমাজের বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে রেবেকা তাকে উনিশ শতকে আপন করে নিয়েছিলেন। স্বাভাবিক অর্থেই স্বামীর প্রবঞ্চনা রেবেকার জীবনের ভিত্তি ক্ষয় করে দিয়েছিল। নর্টন, নেইলর প্রমুখ ব্যক্তি যাঁরা মাদ্রাজে থাকাকালীন রেবেকা ও মাইকেলের জীবনের শুরু থেকেই সহায়তা করেছিলেন; জীবনের অপমানকর এমন ঘটনার পর তাঁদের কাছেও রেবেকা আত্মসম্মান নিয়ে মুখোমুখি হতে পারেননি। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা পত্রিকায় শকুন্তলা যন্ত্রণার সঙ্গে স্বীকার করেছে -

> "যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
> ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?"[৩]

প্রকারান্তরে রেবেকার করুণ কণ্ঠধ্বনি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

আশার ছলনায় মোহিত হয়ে নিজের সর্বস্ব দিয়ে যে ব্যক্তিকে বরণ করে নিজের জীবনে স্থান দিয়েছিলেন; তার কাছ থেকে প্রবঞ্চনা পেয়ে রেবেকা সারা জীবনে মাইকেলকে ক্ষমা করতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -

> "শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"[৪]

রেবেকা উপলব্ধি করেছেন যৌবনের উদ্দীপতা যখন তাঁকে ত্যাগ করে যাচ্ছে; সেই অবস্থায় কবির কাছে তাঁর গুরুত্ব কমে গেছে। ভালোবাসা, আবেগ, আন্তরিকতা হয়ে গেছে মূল্যহীন। পৌরাণিক ডিসকোর্সের সঙ্গেই সামাজিক ডিসকোর্স বিনির্মিত হয়েছে এখানে। রেবেকার দুঃখ শকুন্তলার মর্মবাণীতে প্রকাশিত হয়েছে। কবি পৌরাণিক চিন্তন এবং আবহকে প্রতিফলিত করেছেন এই পত্রে। শকুন্তলা জন্মাবধি পালকপিতা মহর্ষি কণ্বের কাছে মানুষ হয়েছে। রেবেকা বড়ো হয়েছেন মাদ্রাজের অরফ্যান অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি চার্লস নর্টনের আনুকূল্যে। কেনেট, নর্টন, নেইলর প্রভৃতিদের সাহায্য, নিরন্তর সহানুভূতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাইকেলকে মাদ্রাজে এক শান্তির নীড় গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু সেই বিপদের বন্ধুদের কাছে মুখ তুলে তাকাবার মতো পরিসর তিনি রাখতে পারেননি। অনসূয়া - প্রিয়ংবদার অপবাদ যেমন শকুন্তলাকে ছিন্নভিন্ন করেছে; তেমনই এ পত্রে পাঠক অনুভব করতে পারেন শকুন্তলার মনের অবস্থা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মন্তব্য -

> "পুরাণ থেকে কাহিনি ও চরিত্র তিনি নিয়েছেন বটে, কিন্তু পুরাণের যুগের মেয়েদের চিত্তে ভরে দিয়েছেন আধুনিক যুগের নায়িকাদের মন।"[৫]

বিস্মিত হতে হয় মধুসূদনের এই অনুভূতির স্পর্শ অনুভবের গভীরতা দেখে। ভীষণ অথচ স্বাভাবিক জীবনচর্যাকে মাইকেল প্রতিস্থাপিত করেছেন শকুন্তলার নবনির্মিতিতে। বিলাপের অন্তরালে শকুন্তলার বিরহগাথা পেয়েছে অমৃতত্বের স্বাদ। আর মাইকেলের হৃদয়ব্যাপী যন্ত্রণার জ্বালাময়ী অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে পত্রের ছত্রে ছত্রে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দ্বিতীয় পত্রে তারা সোমের প্রতি যে মুগ্ধতার কথা বলেছে - তা কি রেবেকার তরুণ মাইকেলের প্রতি থাকা অসম্ভব! তৃতীয় যে পত্রে এই অনুভূতি পুনরায় প্রকাশিত হতে দেখা যায় সেটি হল দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী। এই পত্রে রুক্মিণী দ্বারকানাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছে অভিযোগের কাহিনি নিয়ে। পরম নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে তিনি দ্বারকায় এসেছিলেন। এই অসমাপ্ত পত্রে তাঁর হৃদয়জ বেদনার কথা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেছেন এক আত্মনিবেদিতা স্বয়ম্বরা। হেনরিয়েটার দুঃখ - বেদনা যেন ব্যক্তিজীবনে সেভাবেই অনুভব করেছিলেন কবি। পতি নির্বাচনের এই গণ্ডি যেভাবে পত্রে নির্মিত হয়েছে; তাকে বাস্তব জীবনে এনে দেখানোর সময় তা কবির সুখের নীড়কে ভেঙে দেয়। মধুসূদন হেনরিয়েটার নিঃসঙ্গতা, দুঃখ, সমস্যা, নিবেদনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেন তাঁর মর্মসঙ্গিনী রেবেকাকে।

জীবন কবিকে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, যশ দিলেও সেই প্রথম যৌবনের মুকুলিত প্রেমের নিগড়টি আর ফিরিয়ে দেয়নি। হেনরিয়েটার দিক থেকে বিচার করলে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমের পুষ্পার্ঘ্য কবিকেই দান করেছিলেন। কিন্তু আইনত তিনি কবির স্ত্রীর মর্যাদা পাননি। 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। আর হেনরিয়েটা মানসিকভাবে পেলেও আইনত কবিকে পাননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "তাই মধুসূদন পুরাণ চরিত্রটিকে আধুনিক মননে সমৃদ্ধ করতে রুকমিণীর মনের দরজা একটু একটু করে উন্মোচিত করেছেন।"[৬]

হেনরিয়েটা শত সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করে তার মনের মানুষকে পেয়েছেন এবং তার সঙ্গে ঘর করেছেন আজীবন। 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রে রামায়ণের চরিত্রদের নবনির্মাণ করেছেন মধুসূদন। কেকয়ী তার নিজের এবং সেই সঙ্গে তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চয়তা বোধ থেকে তিনি ন্যায়বোধের প্রশ্ন তুলেছেন। রূপসী তরুণী থেকে চারটি সন্তানের জননী রেবেকাকে সহজেই নিজের সৃষ্ট কেকয়ীর সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন মাইকেল। যৌবনের ছায়া যখন কেকয়ীকে ত্যাগ করেছে; তখন স্বামীর মোহভঙ্গ হয়েছে তাঁর রূপ যৌবনের প্রতি। সেই যন্ত্রণা থেকে তিনি সহজেই ব্যক্ত করেন –

> "লইল লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন ভাণ্ডারে আছিল রতন যত,"[৭]

মাইকেল তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে যে কারণেই ঠকিয়ে থাকুন না কেন; রেবেকার নারীমনের ব্যর্থ, সন্তপ্ত হাহাকার কেকয়ীর উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। অনাথা এবং কুমারী রেবেকা মাইকেলকে তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ অবলম্বন ভেবেই তাঁর জীবনে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য চিরসুখের হতে পারেনি। কেকয়ীর অভিযোগ, শাপবাক্য, জীবনের সমস্ত গ্লানি যেন কাঁটার মতো বিদ্ধ করেছে দশরথকে। বলাই বাহুল্য, হেনরিয়েটাকে কেন্দ্র করে সংসারের এই ভাঙন মানতে পারেননি রেবেকা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "মাদ্রাসে ফেলে-আসা তার প্রথম প্রেমিকার সম্ভাব্য বিরহ, প্রবঞ্চনাজনিত ক্ষোভ এবং মর্মস্পর্শী বেদনা এ কাব্যের প্রায় প্রতিটি পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং সেই সঙ্গে অর্জুনের দীর্ঘদিন তাঁর থেকে দূরে থাকার বিরহগাথা প্রকাশ করেছেন লেখক। দ্রৌপদী তাঁর স্বততেজা রূপ পরিহার করে দেখা দিয়েছেন প্রেমিকা রূপে। প্রণয়িনী স্ত্রী তার স্বামীকে নিজের করে পেতে চায়। তার ওপরে চায় নিঃসপত্ন অধিকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্জুন কোনোদিনই দ্রৌপদীকে সেই স্থান দেননি। থেকেছেন বহুবল্লভ হয়ে। সেই বেদনা প্রকাশ করেছেন দ্রৌপদী-

"অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?"[৯]

এখানে পাঠকের মনে রেবেকার মতোই প্রশ্ন জাগে - মধুসূদন কীভাবে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে ফেললেন তাঁর স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের সন্তানদের?

বর্তমান সময়ে তার উত্তর পাবার উপায় নেই ঠিকই; কিন্তু উৎকেন্দ্রিক মনোভাব, অমিতব্যয়িতা, ভুল সিদ্ধান্ত, অপরিণামদর্শিতা ইত্যাদি স্বভাব কবিকে তিলে তিলে শেষ করেছিল। স্থিরমস্তিষ্ক হয়ে তিনি অনেক দিন ধরে কোনো বিষয়কে চালিয়ে যেতে পারেননি। অথচ বাংলা ভাষাকে সালঙ্কারা করে তুলেছেন। তাঁর অপরিমিত ব্যয়বহুল জীবনে অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাধনা করেছেন। যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করেছেন আধুনিক নারীর মননকে। নারী তার সমকক্ষ পুরুষের পাণিপ্রার্থী হতে চায় - একথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু পার্থক্য এখানেই যে, তীব্র হলাহলের এই জ্বালা ব্যক্তিজীবনে তাঁকে ভোগ করে যেতে হয়েছে যাবজ্জীবন।

যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা তাঁর লেখা অসমাপ্ত একটি পত্র। এই পত্রে শর্মিষ্ঠা তাঁর হৃদয়ের যে যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছে - তার প্রতিতুলনায় রেবেকার সে সময়ের করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করা যায়। ছোটো ছেলেটি মৃত। তিনটি শিশুকে নিয়ে মা কীভাবে সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে বেঁচেছিলেন - সেটিই বিস্ময় জায়গায় পাঠকের মনে। সাংসারিক দাবানলের মধ্যে স্ত্রী - সন্তানদের রেখে মাইকেল উচিত কাজ করেননি - এ তো বলাই বাহুল্য। শর্মিষ্ঠা নাটকের মধ্যেও সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত করেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনের দুরূহ, রূঢ় মানসিকতা রূপ পরিগ্রহ করেছে সাহিত্যে। সত্য বলেছেন রবি ঠাকুর-

"কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন।"[১০]

ভাষা, ছন্দ সম্পর্কে যুগোত্তীর্ণ শৈল্পিক মানসিকতা ছিল বলেই তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে শর্মিষ্ঠা নাটক থেকে বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য রচনার শ্রেষ্ঠতায় পৌঁছেছিলেন। প্রকৃত অর্থে হতে চেয়েছিলেন মেঘনাদের মতো বীর, ত্যাগী, সম্মাননীয় ব্যক্তি। হয়ে পড়লেন রাবণের মতো শুধুই ভাগ্যদেবীর হাতে বিড়ম্বিত চরিত্র। এক সময় মাদ্রাজ স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর সুখী দাম্পত্যনীড় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কাব্যক্ষেত্রে যশ অর্জনের পর হঠাৎ করেই তাঁর কাব্যচর্চার ইচ্ছা সমাপ্ত হয়ে যায়। পুনর্বার অনিশ্চিত নিয়তির দিকে পা বাড়ান তিনি। আত্মবিলাপ রচনার পর প্রকৃত অর্থে সংশোধিত না হয়ে সপরিবারে বিদেশযাত্রা তাঁর জীবনে পুনর্বার চরম অসাচ্ছন্দ্য ডেকে এনেছিল।হঠকারিতা ছিল তাঁর স্বভাবের অঙ্গীভূত। সেই স্বভাবকে তিনি জীবদ্দশায় অতিক্রম করতে পারেননি। নলের প্রতি দময়ন্তী – 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যের এরকম একটি অসমাপ্ত পত্রিকা। সেখানে ভাগ্যবিড়ম্বিতা দময়ন্তী তার দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়েছেন নলকে। জীবনের বোধ আর দর্শন ক্রমশ স্পষ্ট করেছিল তার দুর্ভাগ্যের মিনারটিকে। প্রাপ্য সম্মান, প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর, ইচ্ছামতো বিলাসব্যসন - যা তিনি আজীবনকাল চেয়েছিলেন তা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর থেকে আর পাননি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাকে ছাড়া অকল্পনীয় - সেই মধুসূদনের জীবনের শেষ পরিণতি বড়ো কষ্টের।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নারীরা পুরাণের পাতা থেকে উঠে এলেও ছিলেন আদ্যান্ত আধুনিক নারী। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও নারী চেতনার মহীয়ান আদর্শ বুঝে নিতে পেরেছিলেন তাঁরা। উনিশ শতকের যে সময়পর্বে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ব্রাত্য; ব্রাত্য তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বোধ সেইসময় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর মুক্তি আন্দোলনে এই দু'জনের অবদান মধুসূদনের জ্ঞানপিপাসাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। উচিৎ-অনুচিত এর প্রশ্ন তোলাই যেখানে বিড়ম্বনা - সেখানে নারীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কণ্ঠে প্রতিবাদের সুতীব্র ধ্বনি, পরাভূত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে করিয়ে দেয় পরবর্তীকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "আমি চিত্রাঙ্গদা।
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।"[১১]

মাইকেলের মতো স্বাধীনচেতা মানুষ স্বাভাবিক অর্থেই ব্যক্তিজীবনের লবণাক্ত স্বাদ কাব্যের মাধুর্যে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। রেবেকা নিজের যৌবনশ্রী পূর্বের মতো অটুট না থাকায় কোনো দ্বন্দ্বে থাকেননি। তাঁর কাছে স্বামী এবং সন্তানরাই ছিল সব। অন্যদিকে নিজের মিষ্ট দাম্পত্যের নিবিড়তায় ঘুণপোকার প্রবেশ টের পেয়ে তিনি কিছু করতে পারেননি। রেবেকা সুশিক্ষিতা না হলেও একদম অশিক্ষিতা ছিলেন না। মাইকেলের মতো অমিতাচারী মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটাবার ফলে সুগৃহিণী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মাতা - পিতার স্নেহবঞ্চিতা নারী মনের কষ্ট ভাষায় প্রকাশে অপারগ হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবোধে উদ্দীপিতা হয়ে তিনি মেনে নেননি মাইকেলের দুরাচারিতাকে। মাইকেল হয়তো মহাভারতের কাহিনির মতো চেয়েছিলেন, যযাতির সঙ্গে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা - উভয়ের মিলনের মতোই রেবেকা মেনে নেবেন হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। কিন্তু আত্মঅভিমানিনী আধুনিকা নারী রেবেকা যে মধুকবিরই নির্বাচিতা স্ত্রী। এই সংসারত্যাগী মনোভাব, মর্মবিদারী ক্ষোভ এবং সন্তানদের প্রতি অবিচারের ইতিহাস যেন বিদ্যুৎশিখার মতো ঝলসে উঠেছে মাইকেলের জীবনে। সাহিত্য সমাজ জীবনের সঙ্গেই মানুষের মনের দর্পণ। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে মাইকেলের আত্মবিলাপের কাতর স্বীকারোক্তি। যাঁকে উৎসর্গ করলেন 'বীরাঙ্গনা' সেই করুণাসাগর বিদ্যাসাগর মধুর মাদ্রাজে ফেলে আসা পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছিলেন কিনা তাঁদের পত্রালাপ থেকে জানা যায় না। তবে এই স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে সমকালীন কলকাতা শহরের সত্তায় আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকবে।

পৌরাণিক নারীদের মতোই রেবেকা যদি চিঠি লিখতেন তাঁর প্রেমাস্পদ মাইকেল কে তবে সেখানে শকুন্তলা, রুক্মিণী, তারা অথবা জনার ভাষাই পাওয়া যেত। রেবেকার মনোবেদনা, অসহায়তা, নিঃসঙ্গ অবস্থা পাঠক ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারেন। বাঙালি মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারার মতো মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর সেটি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন মধু কবি। মাইকেলের দুর্গতিপূর্ণ পরিস্থিতির আগেই মাইকেল বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনুভব করেছিলেন বিষয়টি। নারীমুক্তির অগ্রগতিতে বিদ্যাসাগর নারীকে যে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর রূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন- মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা'-তে সেই ভাবেই তাঁর মানসকন্যাদের নির্মাণ করেছেন। যুগান্তরিতা বীরাঙ্গনারা কাব্যের পটভূমিতে বাঙালি পাঠকের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। 'বীরাঙ্গনা'র সংজ্ঞা নানান ব্যক্তির কাছে নানান রকম। জীবনের সংজ্ঞা এবং তার বোধ সবার কাছে সমান নয়। ফলত সেই ভাবালুতায় প্রবাহিত হয়ে চলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামক মহীয়ান পুরুষটির আখ্যান। সমরাঙ্গনে আগত বহুবিধ সমস্যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল সমকালীন সমাজে নারীমুক্তির পরিকল্পনা। 'বীরাঙ্গনা' কালের নিরিখে সেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাঠককে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। মধুসূদনের ব্যতিক্রমী জীবনের ভাষালাপ তাঁর ব্যক্তিজীবনকে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। রেবেকা বা হেনরিয়েটা দু'জনের মধ্যে কারোর কাছে তিনি স্বপ্নপূরণের উৎস রূপে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু সংলাপধর্মিতার অপূর্ব বয়নকৌশলে মধু কবি সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্য। পত্রগুলিতে উল্লিখিত শৈলী কাব্যটিকে দিয়েছে অনন্যতা। কাব্যটির একাত্ম স্মৃতিচারণা নায়িকাদের মনোজ ভাবনার রূপান্তর ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "লেখা তা সে যতই বলার ছাদটি আত্মস্থ করুক, তার শব্দসংযোজনা থেকে বাক্য পরিমার্জনায় থাকে সযত্নতার অন্তক্রিয়া, কথায় তা থাকে না। বীরাঙ্গনা-র নায়িকারা তাদের মনের কথা পত্রে লিখেছেন; সুতরাং বক্তব্য বাকভঙ্গির কাছাকাছি আসলেও প্রসাধনের নিপুণ প্রয়োগ এখানে আছেই।"[১২]

ওভিদের কাব্যের অন্তর্গত পত্রগুলির মধ্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'-র সঙ্গে ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপ; 'সোমের প্রতি তারা'-র সঙ্গে 'হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফিড্রা'; 'দশরথের প্রতি কেকয়ী'-র সঙ্গে 'দেমোফোনের প্রতি ফিলিস' প্রভৃতি নির্দিষ্ট

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পত্রগুলির ক্রমপর্যায়ভিত্তিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি মননকে নারীর মেধা, ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমের গভীরতর স্পন্দনে মাইকেল বীরাঙ্গনা কাব্যের মাধ্যমে এক সমুন্নত শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। একদিকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষটির অন্যায়পূর্ণ আচরণ পাঠকমননে যেমন বিস্ময় তৈরি করে; অন্যদিকে সেই মানুষটির সৃজনশীল রচনার উদাহরণ যুগোত্তীর্ণা নারীকে উপস্থাপিত করে পাঠকের সামনে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

> “বীরাঙ্গনা কাব্য নামকরণের সার্থকতা ফুটে উঠেছে তাদের আচরণে, বাচনে, আত্ম – উপস্থাপনায়।”[১৩]

ব্যক্তি নারীর স্বতন্ত্র বিচারবোধ, জীবন আসক্তি, সৌন্দর্য চেতনা, সুপ্রাচীন সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা সমাজের বুকে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। নারী যদি চিরন্তন সংস্কারের বিরোধী হয়; তাহলে সেখানে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধী আবহ গড়ে উঠতে বাধ্য। বীরাঙ্গনা-র নারীরা সচেতন তাঁদের সামাজিক প্রথাচরণের বিরোধিতায়; কিন্তু তাঁরা পশ্চাৎপদ নন। নবজাগরণের আলোকস্নাতা নারীরা সাহসিকা, অনবরোধচারিণী, স্বাভিমানিনী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> “এই বেদনার্ত বিদ্রোহের মর্মবাণী যেখানে তারা বহন করেছে, সেইখানেই নবজাগ্রত ভাবনার কাছে তারা বীরাঙ্গনা।”[১৪]

মাত্র চার-পাঁচ বছরের সাহিত্যসাধনায় মাইকেল যে অসাধ্যসাসাধন করতে পেরেছিলেন তার অনিবার্যতা এবং অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আদ্যান্ত বঙ্গভাষাবিমুখ ব্যক্তি যে একদিন বাংলা ভাষার বয়ন - বয়ন নির্মাণে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন; সেকথা তিনি নিজেও জানতেন না। সামাজিক পরিসরে বিবাগী, বাউণ্ডুলে অমিতব্যয়ী, নৈতিকতাজ্ঞান অনেকক্ষেত্রে যাঁর রহিত; সেই মানুষটির বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমত্বময় এই অবদানের স্মৃতি শাশ্বত সত্য। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে, মাইকেল তাঁর প্রতিভার যথাযথ মর্যাদা পাননি সমকালে। বরঞ্চ প্রয়াণের পর সমাধিস্থ হতে তাঁর মরদেহের সময় লেগেছে সাধারণের থেকে অনেক বেশি। অথচ পৌরাণিক নবনির্মিতির যুগ তাঁরই হাতে মুকুলিত এবং বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় -

> “এই সব মিলিয়ে বোঝা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কতখানি অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সে যুগে।”[১৫]

আত্মজীবনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মধুকবির মধুহীন জীবনে সাহিত্যের মধুরিমা নিয়ে এসেছিল তাঁর উত্তরাধিকার বীরাঙ্গনা কাব্য। এই কাব্যের পৌরাণিক নারী চরিত্রেরা আলোকস্নাতা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে। উত্তর আধুনিক কালপর্যায়ে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোকস্নাত মধুকবিকে নারীচেতনার একজন সংগঠক হিসেবে কুর্নিশ করতে হয়। সময়ের শতদলে সেই প্রশংসার স্মারক হয়ে থাকে বীরাঙ্গনা।

Reference:

১. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, ১৯৯৪, পৃ. ১০২
২. তদেব, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৭ – ১৪৮
৩. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, (বীরাঙ্গনা কাব্য, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা), ১৯৯৯, পৃ. ৯
৪. তদেব, ১৯৯৯, পৃ. ১০
৫. তদেব, ভূমিকা অংশ, ১৯৯৯, পৃ. ৭
৬. বেরা, মঞ্জুলা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী : স্বয়ম্বরার আত্মনিবেদন, (বীরাঙ্গনা' কাব্যচর্চা, উজ্জলকুমার মজুমদার সম্পা), ২০১৮, পৃ. ২১১
৭. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, দশরথের প্রতি কেকয়ী, (বীরাঙ্গনা কাব্য, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা.), ১৯৯৯, পৃ. ৫৪
৮. মুরশিদ, গোলাম, আশার ছলনে ভুলি, ১৯৯৪, পৃ. ১৫০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 29 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, (বীরাঙ্গনা কাব্য, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা), ১৯৯৯, পৃ. ৬৬
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কাব্যের উপেক্ষিতা, রবীন্দ্ররচনাবলী (৩য় খণ্ড), ১৩০৭, পৃ. ৭৪২
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্ররচনাবলী (২য় খণ্ড), ১৩০৭, পৃ. ২৪১
১২. কৃষ্ণগোপাল রায় (সম্পা), মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, ২০১০, পৃ. ১২৩
১৩. লাহা, জগত, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তি, ২০০২, পৃ. ১০০
১৪. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়), ১৯৮৪, পৃ. ২৪৬
১৫. মিশ্র, নীলাঞ্জন, বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সংবর্তক, ২০২০, পৃ. ৩৫৮